



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 283 - 291

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বিশশতকের পঞ্চাশের বাংলা কবিতা : প্রসঙ্গ দুই বাংলা

ড. কল্যাণ মজুমদার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

লালবাবা কলেজ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত)

Email ID: kalyankushalmazumder@gmail.com

ORCID ID 0009-0000-0909-1488

Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Bengali Poetry,
The 1950s;
Modern Bengali
Poetry, West
Bengal, East
Bengal, Partition
of India, Language
Movement,
Krittiba, Shamsur
Rahman, Sunil
Gangopadhyay.

Abstract

The decade of the 1950s occupies a unique and transformative position in the history of modern Bengali poetry. This article explores the poetic developments of the period by examining the literary trajectories of both West Bengal (India) and East Bengal (then East Pakistan, now Bangladesh) within their shared linguistic and cultural heritage as well as their distinct socio-political realities. The Partition of India in 1947 created two separate political entities, profoundly influencing the themes, sensibilities, and aesthetic orientations of Bengali poets on both sides of the border.

In West Bengal, the trauma of Partition, the refugee crisis, post-Independence disillusionment, economic instability, and the search for individual identity shaped the poetic consciousness of the younger generation. While many poets were influenced by socialist and Marxist thought, the poetry of the decade gradually shifted from overt political commitment to a deeper exploration of personal experience, emotion, language, and artistic freedom. Literary journals such as 'Shatabhisha' and 'Krittibas' played a decisive role in introducing innovative poetic language and modernist sensibilities. The contributions of poets including Sunil Gangopadhyay, Shakti Chattopadhyay, Shankha Ghosh, Alokranjan Dasgupta, Binoy Majumdar, and others are examined in this context.

The article also analyses the parallel yet distinct evolution of poetry in East Bengal. The Language Movement of 1952 emerged as the defining historical force behind the poetic imagination of the period. Bengali poets of East Pakistan transformed linguistic identity,

nationalism, humanism, and cultural resistance into powerful poetic expressions. The works of Shamsur Rahman, Hasan Hafizur Rahman, Syed Shamsul Haq, Abu Zafar Obaidullah, Al Mahmud, and their contemporaries established a new poetic discourse rooted in both modernist experimentation and indigenous cultural consciousness.

By adopting a comparative perspective, the article argues that despite differing political experiences, the poets of the two Bengals remained connected through a common literary tradition while simultaneously creating distinct poetic identities. The 1950s thus represent not merely a chronological

phase but a decisive turning point in the evolution of modern Bengali poetry. The decade permanently reshaped Bengali poetic language, aesthetics, and sensibility, leaving a lasting legacy that continues to inspire subsequent generations of poets and readers across both Bengals.

Discussion

বিশশতকে পঞ্চশের বাংলা কবিতা বলতে আমরা বাংলা কবিতার যে সময়কালের ইতিহাসকে বুঝতে চাইছি, তা হল ১৯৫০ এর শুরু থেকে ১৯৬০ এর ঠিক সূচনার মুহূর্ত পর্যন্ত একদশকের কালখন্ড। রবীন্দ্র সমকালেই বিশশতকের তিরিশের দশক থেকে দশক অনুযায়ী কবিতার ইতিহাসকে দেখবার বিশেষ প্রবণতাকে মান্যতা দিয়েই এই আলোচনার আয়োজন। ১৯৪৭ এর আগে ‘দুই বাংলা’ — এমন কথার অস্তিত্ব থাকলেও প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। ভারতবর্ষের বাংলা ভাষাভাষী যে অঞ্চল চর্যাপদ - শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উত্তরাধিকার বহন করছে তার ভূগোলে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের অস্তিত্ব থাকলেও ৪৭ এর স্বাধীনতা ও ভারত বিভাগের পরই মূলত পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ — এমন সুস্পষ্ট দুটি রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয় অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। বঙ্গের পশ্চিমদিকের মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ নামেই স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়। আর পূর্ববঙ্গ তার বঙ্গ নামটুকুও রাজনৈতিক বাস্তবতার কাছে হারিয়ে ফেলে পাকিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের দূরবর্তী অঙ্গরাজ্য ইস্ট পাকিস্তান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সময়কাল— তখনকার দুই বাংলার একটি হল কলকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গ তথা ওয়েস্ট বেঙ্গল আর অন্যটি হল ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ববঙ্গ তথা ইস্ট পাকিস্তান। আমরা দুই বাংলার প্রেক্ষাপটে আধুনিক বাংলা কবিতার পঞ্চশের দশকের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে চাইছি — তাই এই সমকালীন রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বাস্তবতার প্রসঙ্গটি এই আলোচনার অনিবার্য সূচনা হিসেবেই উপস্থাপিত হল।

একদিকে দেশভাগের যন্ত্রণা অন্যদিকে স্বাধীনতা লাভের আবেগ উচ্ছ্বাস, এই দুই ভাবনার টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে পঞ্চশের দশকের পশ্চিমবঙ্গের কবিমানস। ভাগবাটোয়ারার স্বাধীনতা লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেদিন গৃহহীন করেছিল। সদ্য স্বাধীন দেশের উদ্বাস্তুদের স্রোতে সেদিন ভেসে গেছে কল্লোলিনী স্বাধীন কলকাতার পথঘাট। রাজনৈতিকভাবে কংগ্রেস সরকার সেদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও সার্বিকভাবে এই বঙ্গে বিরাজ করছিল এক ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার নানা নীতিমালা প্রণয়ন করলেও দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সংকট সমাধানের কোন আশু সম্ভাবনা সিদিন ছিল দূর অস্ত। ছিন্নমূল অসহায় পরিবারগুলির পুনর্বাসনের জন্য কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা সরকারের তরফ থেকে পাওয়া যায়নি সেদিন। একদিকে স্বাধীনতা সম্পর্কে হতাশা, স্বাধীন দেশের নতুন সরকার সম্পর্কে মোহভঙ্গ, অন্যদিকে নতুন ভারতের স্বপ্ন নিয়ে কবিতা চর্চায় অগ্রসর হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চশের তরুণ কবি সম্প্রদায়। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সমাজতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী। কেউ কেউ মার্কসীয় তত্ত্বকেই কবিতাচর্চার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য সমাজনিরপেক্ষ আবেগাশ্রিত কবিতার ধারাই প্রাধান্য লাভ করেছে পঞ্চশে।

কবিতার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের চেয়ে পঞ্চশে দেখা দিল কবিতার গুণগত পরিবর্তনের দিকে কবিদের মনোনিবেশ।

“পঞ্চশের কবিতায় দেখা গেল সমাজকে স্বীকার করেও কবিতা ব্যক্তির অভিমুখে মুখ ফিরিয়েছে। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একসময় সমঝোতা করার চেষ্টা করেছে। বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে চল্লিশের কবিরা অক্লান্তভাবে জনগণের কথা বললেও এই ‘পঞ্চশ’ কবিতাকে সদর্থে জনপ্রিয় করেছিল। কবি ও কবিতা সম্পর্কে মধ্যবিত্ত পাঠকের অচেনা আগ্রহ এই সময়ের একটি প্রধান পরিচয়।”^১

অবশ্য পঞ্চশের জীবন ও সমাজে উত্তাপের অভাব ছিল না। স্বাধীন দেশের কবি লক্ষ্য করেছিলেন চারিদিকে হাজারো সমস্যা। অর্থনীতির জাঁতাকলে প্রতিনিয়ত ধর্ষিত হচ্ছে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ। তাই –

“স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কবিতার এই প্রজন্মে, দেখা গেল, স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের অস্থির আনাগোনা, বাঙালি মধ্যবিত্তের নিজস্ব উথালপাথাল, তার আত্মপরিচয়ের তল্লাসি-সম্ভাবনা ও সমস্যার সামাজিক দ্বিধায়।

একদিকে স্বাধীনতার আবেগ অন্যদিকে উদ্বাস্ত সমস্যা, এপারে নিভস্ত এই চুল্লিতে খাদ্য আন্দোলনের আগুন, ওপারে বাহাল্লর ভাষা আন্দোলন এবং অবিস্মরণীয় একুশে ফেব্রুয়ারী।”^২

পঞ্চাশের পশ্চিমবঙ্গের কবিতার প্রধান কবিরা হলেন শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসু, অমিতাভ দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদার, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, পূর্ণেন্দু পত্নী, তারাপদ রায়, শিবশঙ্কু পাল, নবনীতা দেবসেন, আনন্দ বাগচী, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, আলোক সরকার, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। পঞ্চাশের কবিতায় হৃদয় এবং মেধার সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। এই সময়কার কবিদের লেখায় এবং ভাবনায় মধ্যবিত্ত বাঙালির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বিতার সীমারেখা লঙ্ঘিত হচ্ছিল প্রতিনিয়ত। কোন বাস্তব উদ্দেশ্য, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি তথাকথিত ধারণাকে পাশ কাটিয়ে পঞ্চাশ আত্মমগ্ন হয়েছিল নিজের হৃদয়ের গভীরে।

বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসে পঞ্চাশ এক স্বতন্ত্র ইতিহাস। পঞ্চাশের কবিদের মুখপত্র হিসেবে দুটি পত্রিকার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ‘শতভিষা’ (১৯৫১) এবং ‘কৃতিবাস’ (১৯৫৪) — বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাস এই দুটি পত্রিকাকে বাদ দিয়ে লেখা যাবে না। এই দুটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত কবিরা কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এলেন। তাদের এই নতুন কাব্য প্রচেষ্টায় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যের চাইতেও বেশি গুরুত্ব পেল নতুন কালের পৃথিবীর মূল্যবোধের প্রতি আস্থা। ‘শতভিষা’ পত্রিকা গুরুত্ব দিল নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ওপর। কৃতিবাসের পরিচালকদের আগ্রহও ছিল নতুন কালের নতুন কবিতার প্রতি। কৃতিবাসের সম্পাদকমন্ডলী পত্রিকা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি অভিনব সিদ্ধান্ত নিলেন –

“তারা কৃতিবাসের পাতায় প্রকাশ করতে চাইলেন শুধুমাত্র তরুণতম কবিদের রচনা, তারা গোষ্ঠীবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তাকে মান্যতা দিলেন আর সমকালীন পূর্ববঙ্গের কবিদেরকেও বাংলা আধুনিক কাব্যান্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইল কৃতিবাস।”^৩

‘কৃতিবাস’ এবং ‘শতভিষার’ সঙ্গে যুক্ত তরুণতম কবিরা অনুসন্ধান করছিলেন নতুন কাব্যভাষা এবং নতুন প্রকাশ রীতির। বলিষ্ঠ জীবন চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই কবিদল অনেক ক্ষেত্রেই প্রাধান্য দিলেন কবিতার বক্তব্যকে। আঙ্গিকের নিপুণ বিন্যাস নয়, বক্তব্যের সারবত্তাকেই যে গুরুত্ব দেবে মহাকাল সে বিষয়ে প্রত্যয়ী হলেন কেউ কেউ। এদের মধ্যে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করলেন নতুন করে আর জীবনানন্দের প্রভাব এদের অনেকের ভাবনায় এবং ভাষায় ছায়া ফেলল। কৃতিবাসের সম্পাদক অবশ্য একসময় মনে করেছিলেন –

“একথা মানতেই হবে যে কৃতিবাসে এখনো একেবারে নতুন অথচ চমকপ্রদ প্রতিভা আবিষ্কৃত হয়নি।”^৪

তরুণ কবির এই মূল্যায়ন তাৎক্ষণিক। পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ কবিরা বাংলা কবিতায় যে আত্মস্বাতন্ত্র্য, ‘নব্য রোম্যান্টিকতা’^৫ আনলেন তা নতুন এবং চমকপ্রদ। এছাড়া পঞ্চাশের এই নতুন কবিতার যে অভিনবতা তার বৈশিষ্ট্য এরকম-জৈব যন্ত্রণা নেই, কিন্তু জীবন বেদনায় স্পন্দিত; মানুষ ও সমাজের পাশাপাশি বৃহত্তর সঙ্গে সংযোগ; চিন্তাহীন আশাবাদ নয়, ক্ষয়িষ্ণু বোধে তা দীপ্ত; ছন্দ নৈপুণ্য এবং ব্যাকরণগত বিশুদ্ধি। এছাড়া পঞ্চাশের কবিতায় লক্ষ করা গেল –

“গ্রামীণতা, নিসর্গ, ঐতিহ্যচেতনা, গৃহকাতরা, মন্বয়তা, অস্তিবোধ, অতীন্দ্রিয়তা প্রভৃতি প্রবণতা।”^৬

অলোক সরকার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, তারাপদ রায় প্রমুখ কবিরা পঞ্চাশের কবিতায় প্রকাশ করলেন আত্মগত এবং সমাজগত আপন কথা –

“পা-ডোবানো অলস জল, এখন আমায় মনে পড়ে?

কোথায় চলে গিয়েছিলাম ঝুরি-নামানো সন্ধ্যাবেলা?

খুব মনে নেই আকাশ-বাতাস ঠিক কতটা বাংলা দেশের

কতটা তার মিথ্যে ছিল বুকের ভিতর বানিয়ে তোলা:

নীলনীলিমা ললাট এমন আজলকাজল অন্ধকারে

ঘনবিনুনি শূন্যতা তাও বৃক্ষ ইব চতুর্ধারে!
কিন্তু কোথায় গিয়েছিলাম? মাঝি, আমার বাংলাদেশের
ছলাৎছল শব্দ গেল অনেক দূরে মিলিয়ে, সেই
শব্দকুহক নৌকাকাঙাল খোলা আজান বাংলাদেশের
কিছুই হাতে তুলে দাওনি, বিদায় করে দিয়েছ, সেই
স্মৃতি আমার শহর, আমার এলোমেলো হাতের খেলা,
তোমায় আমি বুকের ভিতর নিইনি কেন রাত্রিবেলা?”^৭

জলের মতো ঘুরে ঘুরে এক কথা বলা এই হৃদয়বাদী কবিতা পঞ্চাশের নিজস্ব। যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় কবিতার
প্রভাবে পঞ্চাশের দশকে বাংলা কবিতায় ভিন্ন ভঙ্গিতে আবার ফিরে আসতে শুরু করল –

“আদর্শবোধের ব্যর্থতা, ব্যক্তিগত অনুভূতি, কবিকৃতির উগ্রতা, নৈঃসঙ্গ্যবোধ প্রভৃতি প্রবণতা।”^৮

পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রধান কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি প্রধানত নারী, প্রেম ও যৌবনের কবি। সুনীল
মনে করতেন পৃথিবীর সব কবিতাই প্রেমের কবিতা। তাঁর কবিতার মধ্যে আমরা পেয়েছি যৌবনোচিত আত্মপ্রকাশ এবং
আত্মঘোষণা। পঞ্চাশের কবিতার আরেক প্রধান নাম শক্তি চট্টোপাধ্যায়, যিনি –

“আধুনিক কবিতার কফি হাউসে প্রবেশ করলেন সুবোধ্যতম কবিতা হাতে নিয়ে। শুধু সুবোধ্য নয়
সুশাব্যও। অনেকদিন পর কবিতা-কষ্টের মধ্যে অস্বস্ত পীড়িত পাঠক শক্তির কাছে পেলেন এক
অপ্রত্যাশিত প্রায় অবিশ্বাস্য ছন্দে প্রত্যাবর্তন। ছন্দ ও আধুনিক কবিতার মধ্যে যে অহি-নকুলটি এতদিন
শার্দূলের মতো বেড়ে উঠেছিল শক্তি প্রথমেই তাকে বধ করলেন ছন্দের তীক্ষ্ণ অব্যর্থ তীর ছুঁড়ে।”^৯

সহজ অথচ গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ অথচ সোজাসাপটা, ছন্দ মিলের চাতুরী নয়, হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়ে শব্দের গণিমাণিক্য তুলে
আনলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় –

“ছেড়ে দিয়েছে বলেই আমি সোনার মাছি জড়িয়ে আছি
দীর্ঘতম জীবন এবার তোমার সঙ্গে ভোগ করেছি
এই রোমাঞ্চকর যামিনী-সোনায় কোনো গ্লানি লাগে না
খুন করে নীল ভালোবাসায় চমকপ্রদ জড়িয়ে গোলাম!”^{১০}

সবমিলিয়ে বাংলা কবিতার ইতিহাসে সুনীল-শক্তি-অলোকরঞ্জন-শঙ্খ ঘোষদের মাধ্যমে এল এক নতুন যুগ।
আত্মপ্রকাশের প্রবল অহংকার নিয়ে পঞ্চাশ কবিতায় গদ্য-পদ্যের সীমারেখাকে ভেঙে আত্মস্থ করল হাংরি, শ্রুতি ইত্যাদি
তথাকথিত কাব্যান্দোলনের সুরকে। তাদের এই প্রচেষ্টার প্রধানতম মুখপত্র ছিল কৃতিবাস –

“যাকে বলা হত কৃতিবাস গোষ্ঠী, সেই গোষ্ঠীর নামে অভিযোগ ছিল ভাষা নিয়ে হইহল্লা, ভাঙচুর,
অসামাজিক জীবনযাপন ইত্যাদি। কথাগুলি একেবারে মিথ্যেও নয়। ঘোষিত ভাবে তরুণতম এই পত্রিকার
তরুণরা তো অবশ্যই অবশ্যই ভাষাবিপ্লবী, এবং সবরকম বিপ্লবেই যেমন কিছু কিছু বাড়াবাড়ি থাকে,
শুদ্ধতার গায়ে পদাঘাত লাগে, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।”^{১১}

ভালোবাসার জন্য হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে পঞ্চাশের কবিরাজ নিজেদের অভ্যন্তর জীবনের চলার পথের ছন্দ রেখার
ইতিবৃত্তকেই তাদের ভাবনা এবং আবেগকে যৌবনধর্মের রহস্যময় রমণীয়তাকে বিশুদ্ধ কবি চেতনার রসে জারিত করে যে
কবিতা লিখেছিলেন তা বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসকে চালিত করেছে নতুন পথে। শুধু প্রেম, নিসর্গ বা সমাজ চেতনা
নয় ব্যক্তি এবং সমাজের টানাপোড়েনে আপন অস্তিত্বের ঘোষণায় পঞ্চাশের কবিতায় এল নানা বৈচিত্র্য। চিরাচরিত
কাব্যসংস্কারকে অতিক্রম করে পঞ্চাশ শুরু করল নতুনতর কাব্যসাধনা। প্রকাশভঙ্গিমা, ভাষা, ছন্দ, ঐতিহ্যচেতনা, লোকজ
অনুষঙ্গ সবদিক থেকেই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশ নির্ধারণ করে দিল কবিতার নতুন গতিপথ।

পঞ্চাশ পূর্ববর্তী বাংলা কবিতার মানচিত্রে পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশের উপস্থিতি ততটা উজ্জ্বল নয়। যে
পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী পঞ্চাশের দশকে কবিতা চর্চায় অগ্রসর হলেন তাদের প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল বাহ্যিক ভাষা

আন্দোলন। দেশভাগের পর থেকেই পূর্ববঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজ করতে থাকে একধরনের অস্থিরতা। দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে ইসলাম এবং ভাষা হিসেবে উর্দুকে প্রাধান্য দিতে থাকল আর লাহোর প্রস্তাব অস্বীকার করে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের সম্ভাবনাকে বাতিল করা হল। একদিকে সামাজিক মানুষের দারিদ্র্য, অসহায়তা; অন্যদিকে স্বৈরাচারী সরকারের দমন-পীড়ন বাংলা ভাষাভাষী পূর্ববঙ্গের মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত করল। ফলত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর স্তিমিত হল একসময়।

ইতিপূর্বে বাংলা কবিতায় চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির গতিপথ নির্ধারণ করতে চেষ্টা করছিলেন চল্লিশের দশকের যে ইসলামপন্থী বুদ্ধিজীবীগণ, ভাষা-আন্দোলনের প্রবল প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বরের কাছে তারা হার মানলেন। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পূর্ববঙ্গীয় বাঙালি জাতির উপর চাপিয়ে দেবার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল রফিক, শফিক, বরকত, জব্বারের রক্তের বিনিময়ে। পৃথিবীর ইতিহাসেই ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য এই রকম স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলনের নজির নেই। পাকিস্তান পন্থীদের পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, তমদুন মজলিস, রওনক সাহিত্য সংস্থা প্রভৃতির বিরুদ্ধে গড়ে উঠল পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। এই সংসদের উদ্যোগে ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কবিতার সংকলন ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত এই সংকলন নির্ধারণ করে দেয় পরবর্তীকালের পূর্ববঙ্গীয় কবিদের কবিতা চর্চার গতিপথ।

রবীন্দ্র পরবর্তী তিরিশের দশকের বাংলা কবিতা যে আধুনিকতার পথে যাত্রা করেছিল সেই একই বাঙালি চেতনা এবং ঐতিহ্যের সূত্রে যে তরুণ মানবতাবাদী কবিসম্প্রদায় পূর্ববঙ্গের পঞ্চাশের দশকে কবিতাচর্চায় এলেন তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্যরা হলেন শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), আজীজুল হক (১৯৩১), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪), আলাউদ্দীন আল আজাদ (১৯৩২), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৬), আলমাহমুদ (১৯৩৬) প্রমুখ। ইতিপূর্বে উল্লিখিত ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ (১৯৫৩) এবং ‘নতুন কবিতা’ (১৯৫০) - এই দু’খানি সংকলনে প্রকাশিত হল নতুন সৃষ্ট এক সমাজের প্রতিনিধিত্বান্বিত কবিদের কাব্যদর্শনের নতুন রূপ। ওপার বাংলার কাব্যচর্চার ইতিহাসে পঞ্চাশ যেন তাই এক নতুন সূচনা। নতুন চেতনায় উজ্জীবিত এই কবিকুলের মধ্যে ছিল অসংযম, ছিল আবেগের আতিশয্য, কিন্তু যে বিশুদ্ধ মানবিক চেতনা তারা সঞ্চারিত করলেন তাদের লেখায়, তার অনুপ্রেরণা তারা পেয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের জল, মাটি থেকেই। বাংলার যে রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন কবি জীবনানন্দ সে রূপ তো পূর্ববঙ্গের নিসর্গেই দেখেছিলেন কবি।

পূর্ববঙ্গের এই পঞ্চাশের কবিদের কাব্যচর্চা তাই তিরিশের ঐতিহ্যসূত্রে অনুপ্রাণিত হলেও তারা যাত্রা করলেন নতুন পথে। সে পথ সহজ লোকচেতনার পথ, আবেগের পথ, উদ্দীপনার পথ। এভাবেই আবহমান বাংলা কবিতার চিরাচরিত ঐতিহ্যসূত্রেই পূর্ববঙ্গের কবিতার সুরে এবং স্বরে এল ভিন্নতা।

“বাংলাদেশের সাহিত্য বিশেষত কবিতা উত্তীর্ণ হলো নতুনতর ভাবনায়। প্রথমত, সাম্প্রদায়িক বা ইসলামি মনোভঙ্গি অপসৃত হয়ে গিয়ে তাতে প্রাধান্য পেতে শুরু করল মানবতাবাদী এবং সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। কবিদের যৌথ কাব্যভাবনায় প্রকাশ পেল বুর্জোয়া মানবতাবাদ, দর্শন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিবাদী মন, রোম্যান্টিকতা, স্মৃতিরোমন্থন, পরাজয়চেতনা, ভাববাদ-বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব, পলায়নী মনোবৃত্তি, আত্মরতি, ইতিহাসজ্ঞান প্রভৃতি।”^{১২}

পঞ্চাশের পূর্ববাংলার কবিতার প্রধান অভিযুক্ত একুশের চেতনা। পঞ্চাশের নতুন প্রজন্মের কবিরা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিজীবনে প্রায় একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তাই তাদের কবিতার সুর এবং স্বর প্রায় একই রকম।

“তবে শামসুর রাহমান যেখানে পরিশীলিত ছিলেন নাগরিক বৈদগ্ধ্য, সেখানে ভাষাশৈলী ও চেতনার দিক থেকে হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন সবচেয়ে অগ্রসর। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ যেখানে ছড়ার আঙ্গিকে সমকালীন ভারতবর্ষকে ধরতে চেয়েছেন তার কবিতায়, সৈয়দ শামসুল হকের রচনায় সেখানে গদ্যরীতিতে এক অননুকরণীয় ভাষায় উপজীব্য হয়ে উঠেছে তার মনোবিকলনজাত আত্মসংকট।”^{১৩}

পঞ্চাশের পূর্ববাংলার অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমান। মানবতাবাদী এই কবির মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল একধরনের নব্য রোম্যান্টিক কাব্য প্রবণতা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিক সাহিত্যের মৌলপ্রবণতাকে আত্মস্থ করেই কাব্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন শামসুর রাহমান। তিরিশের দশকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত বাংলা কবিতার আধুনিকতার যথার্থ উত্তরসূরী এই কবি।

“শামসুর রাহমানই সেই শক্তিমান ও ভাগ্যবান আধুনিক, এবং সর্বাংশে আধুনিক, যাঁর কবিতা আধুনিক চেতনা চৈতন্য-সংবেদনশীলতার উন্মেষখচিত চিহ্ন নয় শুধু, বরং সমৃদ্ধ আধুনিক চেতনার উজ্জ্বল উৎসারণ।”^{১৪}

হৃদয়ের ক্রোধ, ঘৃণা, ভালোবাসা সবকিছুই শামসুর রাহমান প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিতায়। বাংলাভাষার প্রতি অপরিসীম আবেগমণ্ডিত ভালোবাসা ছিল এই কবির। শিল্প এবং সমাজ দুইয়ের প্রতিই দায়বদ্ধ ছিলেন কবি। ভাষাই তার একমাত্র আত্মপরিচয়। বাংলা ভাষার অমর্যাদা কবিকে দাঁড় করায় অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি -

“তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?
উনিশশো' বাহান্নের দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।
সে-ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হ'লে আমার সত্তার দিকে
কত নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।”^{১৫}

শামসুর রাহমানের প্রেম চেতনার সঙ্গেও যুক্ত থাকে স্বদেশ ও ভাষাচেতনা। স্বদেশকেন্দ্রিক আনন্দ, বেদনা, বিস্ময়ই তাঁর কাব্যের প্রধানতম বিষয় হয়ে উঠেছে বারবার। শিল্প এই কবির কাছে ছিল সাধনার মতো। যত্ন করে হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়ে শব্দের মণিমাণিক্য তুলে আনবার অলৌকিক দক্ষতা অর্জন করেছিলেন শামসুর রাহমান। শুধু পঞ্চাশের দশক নয়, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে বাংলাদেশের কবিতার প্রধান নাম শামসুর রাহমান।

পঞ্চাশের পূর্ববঙ্গের অন্যতম আর এক শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিভা হাসান হাফিজুর রহমান। তাঁর কবিতায় আছে মানুষ, সমাজ এবং শিল্পের সমন্বয়। ইউরোপীয় রোম্যান্টিক কবিদের কাব্যদর্শকে দেশকালের পটভূমিকায় এক স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছেন এই কবি। তাঁর স্বদেশ চেতনায় আছে এক অস্তিত্বচেতনা। একমাত্রিক সরল রোম্যান্টিকতা নয়, দ্বিধাদীর্ণ মানুষের জটিল মনস্তত্ত্ব উন্মোচিত হয়েছে হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতার ছত্রে ছত্রে। চেনা পৃথিবীর রহস্যময় নিসর্গে রোম্যান্টিক স্বপ্নপ্রয়াণ নয়, জীবনের যন্ত্রণার মধ্যেই আলো, ধ্বনি, প্রাণ আর অন্নের আকুলতায় জীবনের মানে অনুসন্ধান করেন এই কবি -

“আমার প্রকৃতি এই, ধুলো-মাটি নেই
নদী-নালাহীন, ছায়ামায়াঘন বনবাতাসের ধ্বনি নেই—
শহরে রাস্তায় পিচে প্রাণহীন লোকালয়
আহা প্রাণহীন লোকালয়।
আমার প্রকৃতি নেই, অল্পবিভ মানুষের ভিড়ে
ঠেলাঠেলি, সুযোগ-শিকারে
সিঁড়ি-বাওয়া ধ্যানে। অনন্ত ক্ষুধায় আর একান্ত সন্তান
মিথ্যাচারে
স্বাপদের শান্তি জ্বলে ওঠে,
আমরা কেউই ঠিক কারো নই
স্মৃতির আগুনে জ্বলে জীবনের জ্বালা
ভুলব না, ভুলতে পারি না কিছুতেই।”^{১৬}

স্বদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসা, তার অস্তিত্বের সংকট এভাবেই বারে বারে উঠে এসেছে হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায়। মধ্যবিত্ত মানসিকতার সংকট, আত্মধিকার, আত্মআবর্তন তার চেতনার জাগরণ, এই কবির কবিতায় অজস্র প্রাণ প্রাচুর্য্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। একথা বলা অসঙ্গত নয় যে পঞ্চাশের –

“এই পর্বের আধুনিকতার প্রধান কবিপুরুষ হচ্ছেন হাসান হাফিজুর রহমান। স্বকীয় কাব্যভাবনা এবং কবিতায় এর পরোক্ষ প্রয়োগ, এ দুটি ক্ষেত্রে তার সাফল্য শুধু ঈর্ষণীয় নয়, তিরিশের কবিতার পর তিনিই সৃজনশীলতা এবং ভাবনায় বাংলা কবিতাকে দিতে পেরেছেন এক ভিন্নতর তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা। একমাত্র সমসাময়িক শঙ্খ ঘোষ ছাড়া অন্য কারো কবিতায় পাওয়া যাবে না এই ব্যতিক্রমী সাফল্যের পরিচয়।”^{১৭}

পঞ্চাশের দশকে শামসুর রাহমান এবং হাসান হাফিজুর রহমানের পরে যে কবি পূর্ববাংলার আধুনিক কবিতাকে সাফল্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দিয়েছেন তিনি আল মাহমুদ। ‘লোকান্তর’ (১৯৬৩), ‘কালের কলস’ (১৯৬৭), ‘সোনালি কাবিন’ (১৯৭৩) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা আল মাহমুদ এপার ওপার দুই বাংলায়ই কবি হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। গ্রামীণ অনুষ্ণে প্রাণময় তার কবিতা। নারী এবং নিসর্গের এমন অসাধারণ চিত্ররূপ খুব কম কবির কবিতাতেই পেয়েছি আমরা। গভীর ইতিহাসবোধ, সাম্যবাদী চেতনা, প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ আর শেষপর্যন্ত স্বদেশানুরাগে উদ্দীপ্ত এই কবির লেখনীতে প্রেমের এক নতুন ভাষ্য তৈরি হয় –

“নদীর সিকন্তী কোনো গ্রামাঞ্চলে মধ্যরাতে কেউ
যেমন শুনতে পেলে অকস্মাৎ জলের জোয়ার,
হাতড়ে তালাশ করে সঙ্গিনীকে, আছে কিনা সেও
যে নারী উন্মুক্ত করে তার ধন-ধান্যের দুয়ার।
অন্ধ আতঙ্কের রাতে ধরো ভদ্রে, আমার এ-হাত
তোমার শরীরে যদি থেকে থাকে শস্যের সুবাস,
খোরাকির শত্রু আনে যত হিংস্র লোভের আঘাত
আমরা ফিরাবো সেই খাদ্যলোভী রাহুর তরাস।
নদীর চরের প্রতি জলে-খাওয়া ডাঙার কিষণ
যেমন প্রতিষ্ঠা করে বাজখাই অধিকার তার,
তোমার মস্তকে তেমনি তুলে আছি ন্যায়ের নিশান
দয়া ও দাবিতে দৃঢ় দীপ্তবর্ণ পতাকা আমার;
ফাটানো বিদ্যুতে আজ দেখো চেয়ে কাঁপছে ঈশান
ঝড়ের কসম খেয়ে বলো নারী, বলো তুমি কার?”^{১৮}

নতুন এই ভাষারীতির ব্যবহারে প্রাণময় হয়েছে পূর্ববাংলার কবিতার পঞ্চাশের দশক। এভাবেই অনেক প্রতিভাবান কবির কবিতাকর্মে পূর্ববাংলার কবিতার পঞ্চাশের দশক আবহমান বাংলা কবিতার মূলধারায় যুক্ত হয়েছে। পরবর্তীকালের পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের কবিতার যে প্রাণবান অস্তিত্ব, তার অনুপ্রেরণা এই পঞ্চাশের দশক।

বাংলা কবিতার ইতিহাসে দুই বাংলার প্রেক্ষাপটেই পঞ্চাশের দশকের তাৎপর্য বিশেষ। সুনীল, শক্তি, শামসুর, আল মাহমুদ প্রমুখ নাম বাংলা আধুনিক কবিতাকে পাঠকপ্রিয়তার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। কেউ কথা রাখেনি হয়তোবা, তবুও কেউ কেউ এঁদের অনুপ্রেরণাতেই কবিতার পথে পথে হেঁটে অবনীর বাড়ি পৌঁছে গিয়ে দরজায় নিরন্তর কড়া নেড়েছে, নাড়ছে। পঞ্চাশের কবিতাই সুস্পষ্টভাবে এমন ভাবনাকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, কবিতাকে শেষ পর্যন্ত কবিতা হয়েই বাঁচতে হয়। সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির উঠোনে কবিতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আসনটি নির্ধারিত থাকেনা ঠিকই, কিন্তু পাঠকের হৃদয়ে কবিতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আসনটিই নির্ধারিত।

এই কারণেই পঞ্চাশের কবিতার উত্তরাধিকার আজও অম্লান। সময়ের পরিবর্তন, প্রযুক্তির বিস্তার, বিশ্বায়নের অভিঘাত কিংবা সাহিত্যরুচির বিবর্তন— কোনোটিই এই দশকের কবিতার শিল্পমূল্যকে ম্লান করতে পারেনি। বরং দুই বাংলার কবিরা নিজ নিজ সমাজবাস্তবতা, ইতিহাস, দেশভাগের ক্ষত, ভাষা-চেতনা, প্রেম, অস্তিত্ব সংকট এবং ব্যক্তিমানসের গভীর অন্বেষণকে এমন এক নান্দনিক উচ্চতায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা বাংলা কবিতাকে আন্তর্জাতিক আধুনিকতার সঙ্গে সংলাপে যুক্ত করেছে। এই কবিতাগুলি আমাদের কেবল ভাষার সৌন্দর্যই শেখায় না; শেখায় আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান, মানবিকতার গভীর বোধ এবং সৃষ্টিশীল স্বাধীনতার মূল্য। তাই পঞ্চাশের কবিতা কোনো নির্দিষ্ট দশকের সাহিত্যিক সম্পদমাত্র নয়; এটি বাংলা কাব্যধারার এক অনিবার্য মাইলফলক, যার আলোয় আজও নতুন প্রজন্মের কবিরা নিজেদের কাব্যভাষা নির্মাণের সাহস ও প্রেরণা খুঁজে পান।

আদি কবি বাল্মীকির হৃদয়ের শোক থেকে উদ্ভিত হয়েছিল যে উচ্চারণ, তা বিশ্বচরাচরে আজ পরিব্যাপ্ত। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলা কবিতার পঞ্চাশের দশকও প্রমাণ করে দিয়েছে— মানুষের হৃদয়ের গভীরতম অনুভব, যন্ত্রণা, স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের ভাষা হিসেবে কবিতা কখনও তার আবেদন হারায় না; বরং যুগে যুগে নতুন অর্থে, নতুন ব্যঞ্জনায় এবং নতুন পাঠকের হৃদয়ে পুনর্জন্ম লাভ করে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত, 'স্বাধীনতা উত্তর পঞ্চাশ বছরের বাংলা কবিতা : একটি রূপরেখা' / *কবিতা নিয়ে*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪১১, পৃ. ১৬৩
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (সম্পাদকীয়), *কৃতিবাস*, প্রথম সংকলন, শ্রাবণ, ১৩৬০, পৃ. ১
৪. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'কাব্যভাষা', *কৃতিবাস*, প্রথম সংকলন, শ্রাবণ ১৩৬০, পুনর্মুদ্রণ, কৃতিবাস সংকলন-১, পৃ. ২৩
৫. দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু, 'সেনেট হলে কবি সম্মেলন', *কৃতিবাস*, তৃতীয় সংকলন, ১৩৬১, পুনর্মুদ্রণ: কৃতিবাস সংকলন ১, সম্পাদক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৪৫
৬. মাসুদুজ্জামান, কাব্যবিশ্লেষণ, *পঞ্চাশের নতুন কবিদের কবিতা, বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৯৭
৭. ঘোষ, শঙ্খ, 'অলস জল', *শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭০, অষ্টম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৩৪
৮. মাসুদুজ্জামান, 'কাব্য বিশ্লেষণ, পঞ্চাশের নতুন কবিদের কবিতা', *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৯. চক্রবর্তী, জগন্নাথ, 'জিরাফ-নক্ষত্র-সোনারমাছি', *লেখা ও রেখা*, আশ্বিন ১৩৭৪; এই উদ্ধৃতির উল্লেখ আছে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর লেখা 'পঞ্চাশ' নামক প্রবন্ধে, আধুনিক কবিতার ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭
১০. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, 'নীল ভালোবাসায়', কাব্যগ্রন্থ - *সোনার মাছি খুন করেছে; শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৭৩, নবম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪২
১১. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'কৃতিবাসের সুবর্ণজয়ন্তী', কবিতা কার জন্য? *পরম্পরা*, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: ২০১১, পৃ. ১১১
১২. হোসেন, সৈয়দ আকরম, 'কথামালা এবং পূর্ববাংলার কবি ও কবিতা', *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি - ১৯৮৫, পৃ. ৩৭
১৩. মাসুদুজ্জামান, 'কাব্য বিশ্লেষণ : পঞ্চাশের নতুন কবিদের কবিতা', *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৩৩

-
১৪. এই বক্তব্য বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের, তিনি শামসুর রাহমানকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ‘নিঃসঙ্গ শেরপা’ লিখেছিলেন, এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায় তার ‘শামসুর রহমান : সময়ের মুখোমুখি’ নামক প্রবন্ধে, গ্রন্থের নাম ‘ওপার বাংলার কবি ও কবিতা’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৭, পৃ. ১৬
১৫. রাহমান, শামসুর, ‘বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’, শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৮৫, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০০২, পৃ. ৭১
১৬. রহমান, হাসান হাফিজুর, ‘স্মৃতির আগুনে জ্বলে (অংশ)’, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, সম্পাদনা : রণজিৎ দাশ ও সাজ্জাদ শরীফ, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ : ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০১১, পৃ. ১১০
১৭. মাসুদুজ্জামান, বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
১৮. আল মাহমুদ, ‘সোনালি কাবিন ১২’, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭